ইসলাম জীবনের ধর্ম

শরীফ মুহাম্মদ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আল কাউসার
বিভাগীয় সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

জীবনের জন্য

ভাষায়-শব্দে স্বাতন্ত্র্য
পয়লা বৈশাখ : এখন যেমন
প্রসঙ্গ মোহর : উদাসীনতা ও কিছু কথা
যৌতুক : কনের অশ্রু, বরের উল্লাস
চিরন্তন দশ অসিয়ত
আধুনিক শিক্ষিত দ্বীনদার : ত্যাগ সারল্য ও বিড়ম্বনা
দুর্নীতি : জাহেলিয়াতের নতুন অন্ধকার
সরকারের ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম শরীয়াভিত্তিক হতে পারে
এ দেশে সংস্কৃতি : বিকৃতি ও বিভ্রান্তি
মাতৃজাতির সম্ভ্রম বেচাকেনা বন্ধ করুন
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য
মুসলমান : পারস্পরিক দায়িত্বের বন্ধন
সুন্নতের গুরুত্ব : অনুসরণ-অবহেলার কিছু কথা
মৃত্যুর দুই পাশে
ছোটদের প্রতি স্নেহ দ্বীন ও বিবেকের দাবি
বিপদ-আপদ-মুসীবতে অনুযোগ নয়, প্রত্যাবর্তন ও অনুতাপই শেষ কথা
অহেতুক ও অবান্তর প্রশ্ন ত্যাগ করাই সদ্‌গুণ
মাহে রমযান : পারস্পরিক সহযোগিতা বিবেচনা দায়িত্ব ও ছাড়ের কিছু কথা
ফেতরার উচ্চ হারগুলোর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে উপকৃত হবে সমাজের অভাবী মানুষ
সেক্যুলার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গল্প

মনীষীর মুখোমুখি

রমযানে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন
–শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)
গরিব মানুষদের ঈদের আনন্দে শরিক করুন
–মুফতী ফজলুল হক আমিনী
কুলির মজুরিও আমার পকেটে ছিল না
–মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
কিছু তরুণ আলেম-লেখকের লেখার মান আশাব্যঞ্জক

–মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
হজ্ব : রওযার ছবি তো দিলে ধারণ করবে, ক্যামেরায় নয়
–মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
শুধু আরবদের নয়, হিজরি মুসলমানদের সন
–মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
বনু কুরাইজাকে পাকড়াও করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতার কারণে
–মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
হাজারখানেক ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস বাংলায়
–আবদুল মান্নান তালিব
ইসলামে শ্রমের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব
–মাওলানা আবদুল জাব্বার, ড. আবদুল মাবুদ ও ড. আ ফ ম আবদুল জলীল
রমজানের শৃঙ্খলাবোধই মানুষকে বুঝতে শেখায় যে সে মানুষ
–বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
দাওয়াতের অন্য নাম ভালোবাসা
–শাহ আবদুল হান্নান
অজানাকে জানা ইসলামের শিক্ষা
–ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ইমাম গাযালী দর্শনশাস্ত্রে সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন
–প্রফেসর ড. এম আবুল কাসেম
কওমী মাদরাসাই আমাদের জীবন ও শিক্ষার ভিত্তি
ড. এবিএম হিযবুল্লাহ
অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন
ড. মুশতাক আহমদ
ড. আবদুল জলীল
প্রফেসর মুহাম্মদ তারেক
ডা. আবদুল বারী

আবেগের ফুলকি

আমাদের আদর্শের ঠিকানা
এই সব হাত গুঁড়িয়ে দাও
ফতোয়া : বিষোদগার চলবে আর কতদিন ?
বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলা প্রকাশনার আলোকিত মাইলস্টোন
জার্মান পণ্ডিত হ্যান্সের বিকৃত ইসলাম চর্চা এবং কিঞ্চিৎ আলোকপাত

بسم الله الرحمن الرحيم

ভাষায়-শব্দে স্বাতন্ত্র্য

ভাষা তো হচ্ছে ভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম। এটি সরাসরি আল্লাহ তাআলার দান। আল্লাহ শিখিয়েছেন মানুষকে। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন : (তরজমা) তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। (সূরা আর রাহমান ৫৫ : ৩-৪) সেজন্যই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যসহ দুনিয়ার সব ভাষাকে আল্লাহর দান হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়। এবং এ কারণে অনুভূতি, কথা ও আচরণে আল্লাহর প্রতি বান্দার কৃতজ্ঞতার বিষয়টিও প্রয়োজনীয়, সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক। অন্তত বিশ্বাসী ও মুমিন বান্দাদের ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্নাতীত।

ভাষা বা ভাব ব্যক্ত করার সাধারণ কৃতজ্ঞতার ধরনটি পরিষ্কার। উচ্চারণ-আবৃত্তিতে মহান রাব্বুল আলামীনের হামদ-সানা পাঠ করা, গুণগান গাওয়া। আল্লাহ তাআলার নাফরমানি হয়, এমন কথা বর্জন করা। তবে, এর সবচেয়ে প্রয়োগ-বহুল ধরনটিই অনেক সময় ধারণায় বিরাজ করে অপরিষ্কার বা অস্পষ্টরূপে। সেটি হলো শব্দ-ভাষার সাধারণ প্রয়োগে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশক অবস্থান বা পরিস্থিতি বজায় রাখা। আল্লাহর একত্ববাদ পরিপন্থি কিংবা ইসলামী স্বাতন্ত্র্য বিনাশকারী শব্দ-ভাষা পরিহার করা। স্বতন্ত্র ইসলামী জাতিসত্তা ও চিন্তাচেতনা রহিতকারী শব্দ পরিভাষা এড়িয়ে চলা। অথচ বাস্তবে শব্দ প্রয়োগ ও ভাষার সাধারণ উপস্থাপনায় এই সতর্কতা রক্ষার কাজটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পালিত হয় না। আর এ ধরনের পরিস্থিতি বেশি ঘটে থাকে অনারব ভাষা-শব্দাবলির ক্ষেত্রে। আমরা বাংলাভাষার ক্ষেত্রেও এ সমস্যাটা অহরহ ঘটতে দেখি। সে সম্পর্কেই এখানে সামান্য কথকতা।

দুই.

বাংলাভাষার শব্দাবলির একটা উৎস সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত-আশ্রয়ী বাংলাভাষার প্রভাবশালী ব্যবহারকারী হচ্ছে এ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়। এ জন্য বাংলায় ব্যবহৃত বহু সাধারণ শব্দে হিন্দুধর্মীয় বোধ ও প্রতীকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সে অর্থে প্রচুর শব্দ আপাত চোখে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তীব্র শিরকি মর্মের বাহক। যেমন : ব্রহ্মাণ্ড, রাহু, সূর্যসন্তান, লক্ষ্মী, অগ্নিপুত্র ইত্যাদি। অপর দিকে এমন কিছু শব্দও রয়েছে যেগুলোর শাব্দিক অর্থে মন্দত্ব নেই, কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের কারণে শব্দটি ইসলামী বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হিসেবে প্রতিভাত হয়। বলা যায় অর্থের বৃত্তে শব্দের অস্তিত্ব নির্দোষ হলেও প্রয়োগের পরিবেশে সেটি অপাংক্তেয়। এর মূল কারণ প্রয়োগের পরিবেশ, পূর্বাপর অবস্থা, সমাজ ও মানুষের সাধারণ রেওয়াজ এবং পরিস্থিতির উপাদান। যেমন এ বছর দেশের বৃহত্তর ডায়েরী ও ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি ক্যালেন্ডার করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের মসজিদের ছবি এবং ছবির বর্ণনা দিয়ে। এরকমই একটি ছবির বর্ণনায় বলা হলো, সেখানে এত সংখ্যক লোক একসঙ্গে 'প্রার্থনা' করতে পারে। মসজিদের ভিতরে যে ইবাদতটি করা হয় সেটির নাম সালাত বা নামায। বাংলাদেশে এই ভাষাতেই শব্দটিকে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে গিয়ে এই সমাজে ওই ইবাদতটিকে 'প্রার্থনা' হিসেবে প্রয়োগ করা আসলে সামঞ্জস্যহীন কিংবা অপ্রাসঙ্গিক। সিয়াম বা রোযাকে যদি কেউ স্বাভাবিক বর্ণনায় লেখে 'উপবাস-পালন' তাহলেও একই সমস্যা হয়। অবশ্য যে সমাজে ব্যাপকভাবে ইসলামের ইবাদতগুলোর পরিচয় অস্পষ্ট সেখানে প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরার জন্য এ জাতীয় শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। সাধারণ পর্যায়ে সাধারণ পরিস্থিতিতে ইসলামী পরিচিতিমূলক শব্দের পরিবর্তে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার সঙ্গত ও শোভন হতে পারে না।

একইভাবে মুসলিম জীবনাচারের সঙ্গে জড়িত প্রাচীন ও সুপরিচিত শব্দগুলোর হঠাৎ বাংলাকরণ নিয়েও অভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। লাশকে ইদানীং বলা হচ্ছে, মরদেহ। দাফন-কাফনকে বলা হচ্ছে সৎকার এবং কাফফারাকে বলা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত। এ জাতীয় বহু শব্দ হঠাৎ 'বাংলা-

প্রবণতা'-রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বকীয়তা হারাচ্ছে। মরদেহ-সৎকার বা শেষকৃত্য এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'টা কার দিতে হচ্ছে? সে কি মুসলিম না কি অমুসলিম? এটা চিহ্নিত করাও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এটা ভাষায়-শব্দে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার একটা ধীর ও লঘু পদক্ষেপ কি না অনেকে তেমন সন্দেহ করছেন। কারণ অন্য কোথাও সেভাবে না চললেও ইদানীং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো আর এফএম রেডিওগুলো এ জাতীয় শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারে যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

তিন.

মুসলিম সমাজে নির্দোষ সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আরেকটা অসঙ্গত ব্যবহারের বাড়তি প্রবণতা শুরু হয়েছে গত দেড় দশক ধরে। এর আগেও এ প্রবণতা ছিল। তবে সেটা ছিল অত্যন্ত অনুল্লেখ্য ও সীমিত পরিসরে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক্ষেত্রে যেন উঠেপড়ে লাগার মতো অতি বাঙ্গালিয়ানার একটা মহড়া শুরু হয়েছে। সেটা হচ্ছে, বাংলা বা বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দে মুসলিম নাম রাখা। অত্যন্ত শ্রুতিকটু এসব 'বাংলা-সংস্কৃত' নামের কারণে এখন মুসলিম পরিচিতি নিয়েও সমস্যা তৈরি হওয়ার ঘটনা ঘটছে। ভাষার স্বাভাবিক ধারায় ওইসব শব্দের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্নের কোনো অবকাশ হয়তো নেই। কিন্তু কোনো মুসলিমের নামে এমন শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট প্রশ্ন ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে। কিছু নামের শব্দ এখানে উল্লেখ করা যাক : স্নেহা, ঐশ্বর্য, পরম, শুভ্র, আশীষ, বর্ষণ, মেঘ, শতাব্দী, শরৎ, শিমুল, সমর। একটু চোখ মেলে দেখলেই অনুভব করা যাবে এ জাতীয় শব্দে এখন বহু মুসলিম শিশু এবং কিশোর-কিশোরীর নাম রয়েছে আমাদের সমাজে। অবশ্য পঞ্চাশ বছর আগেও এ জাতীয় কিছু কিছু শব্দ নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : শিমুল, সজল, রতন, বাদল। তবে প্রবণতার মাত্রাটা ছিল কম। আর শব্দগুলো অত বেশি হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত নাম-শব্দের কাছাকাছি তখন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বহু কিশোর-কিশোরীর নাম শুনে প্রথমে ধর্মীয় পরিচিতি নির্ধারণের প্রশ্নে থমকে থাকতে হয়। বুঝতে একটু দেরি হয়, সে মুসলিম না কি অমুসলিম? এরপর আরো কিছু কথা, আরো কিছু আচরণে সেটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়। এছাড়াও অর্ধেক বাংলা অর্ধেক আরবী শ্রুতিকটু ও মিশ্রভাষার এক ধরনের মুসলিম নামেরও

প্রচলন শুরু হয়েছে। যেমন আশীষ-উর-রহমান, প্রভাষ আমীন, সুমন রহমান, সকাল আহমদ, সমর হোসেন। এসব নামেও পরিচিতি সংকটের পাশাপাশি হীনম্মন্যতার নতুন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়। এসব নামের মধ্য দিয়ে আচরণ ও ভাবে এটাই প্রকাশ হয় যে, নামের জন্য ইসলামী ও আরবী শব্দ যথেষ্ট হয়নি। বাধ্য হয়েই বাংলা কিংবা সংস্কৃত শব্দের কাছে ধরনা দিতে হয়েছে। এটাও সমীচীন হতে পারে না। নামে-শব্দে মুসলিম পরিচয়ের এই ইচ্ছাকৃত সংকট তৈরি কি খুব শোভন কিছু? খুব লাভজনক কিছু? মনে হয় না।

মুসলমানের ওপর মুসলিম নিধনকামী আগ্রাসী শক্তির হামলা নেমে এলে নামের অস্পষ্টতা দিয়ে বাঁচা যায় না। বসনিয়া চেচনিয়ায় বাঁচা যায়নি। অপরপক্ষে দ্বীনী পরিচয়ে কোনো রহমত আসতে চাইলে এ অস্পষ্ট পরিচয়ের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন, ওই নামের কারণে অপরিচিত মানুষ সালাম দিতে দ্বিধায় পড়ে যায়। এটি একটি সরল ও সাধারণ হিসাব। নামের শব্দসংকট থেকে উদ্ভূত আত্মপরিচিতি সংকট মুসলমানকে ধর্মীয় ও জাগতিক নানা রকম সমস্যায় ফেলতে পারে।

চার.

সমস্যার সবটুকু অতি বাংলায়ন প্রবণতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এর একটা দিক ইংরেজির দিকেও গেছে। মুসলিম নামের বাংলায়ন ঘটার পেছনে সাধারণত যে মানসিকতা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে প্রতিবেশ থেকে প্রভাবগ্রহণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অনুকরণ এবং আত্মপরিচিতিমূলক ঐতিহ্যবাদী আরবী-ফার্সী উর্দু শব্দ ব্যবহারে হীনম্মন্যতা। সে কারণে যেভাবে কিছু প্রবণতা বাংলা নামের দিকে গেছে, একইভাবে গেছে ইংরেজিসহ পশ্চিমা কোনো কোনো ভাষার শব্দের দিকেও। সেজন্যই জর্জ, লিংকন ইত্যাদি নাম-শব্দের কিছু ব্যবহারও বাংলাদেশী মুসলমানদের মাঝে দেখা যায়। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা বেশি ঘটে সেটা হচ্ছে, পশ্চিমা সমাজে ব্যবহৃত এমন কিছু বাক্যের ব্যবহার, যা মুসলিম বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। যেমন : কোনো আক্ষেপ ও বিস্ময়সূচক ক্ষেত্রে বলা হয় : ও মাই গড!

সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, ইন্না লিল্লাহ-এর পরিবর্তে 'ও মাই গড' বলায় কেবল ইংরেজি ভাষার প্রয়োগ হয়, এতটুকুই নয়। বরং এ বাক্যে ব্যবহৃত 'গড' শব্দ সব অর্থে ইসলামী বিশ্বাসের 'আল্লাহ' কিংবা 'রহমান'-এর প্রতিশব্দ নয়।

দ্বিতীয়ত নাম-শব্দে হোক কিংবা সাধারণ ভাষার ব্যবহারে হোক স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা মুসলমানের জন্য অবশ্য-করণীয়। অপর কোনো জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুকরণ—সেটা পোশাকে, আচারে, ভাষায় যেক্ষেত্রেই হোক—মুসলামানের জন্য শোভন নয়। আঞ্চলিক জাতীয়তা, আঞ্চলিক ভাষা কিংবা ভূখণ্ডগত অর্থে মাতৃভাষার দোহাই দিয়ে যেমন আমাদের ইবাদতের ভাষা বদল করা যায় না, তেমনি মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-পরিচায়ক ভাষার ক্ষেত্রেও শব্দ ও ভাষা বদলের পথ ধরা সমীচীন হয় না। মুসলিম আত্মপরিচিতির সংকট তৈরির ক্ষেত্রে এ-জাতীয় ছোট ছোট শব্দের ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, আমাদের ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যম-টিভি ও রেডিও এ জাতীয় সংকটের ক্ষেত্র তৈরিতে অতি-উৎসাহী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পাঁচ.

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শিশু ও বয়স্কদের নাম বদলে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে। রয়েছে ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষা বদলে দেওয়ার ঘটনাও। নাম বদলের ক্ষেত্রে কেবল শিরক নয়, অর্থগত অন্য বিষয়েরও ভূমিকা ছিল। সুন্দর-অসুন্দর মর্ম, ক্ষতিকর-কল্যাণকর অর্থ, ডাকার সময় অর্থের হেরফের হওয়ার আশংকা ইত্যাদি কারণেও নবীজি নাম বদলে দিয়েছেন।

মুসলিম শরীফের ২১৩৬, ২১৩৭ ও ২১৩৯ নম্বর হাদীস, তিরমিযী শরীফের ২৮৩৯ নম্বর হাদীস এবং সুনানে আবু দাউদের ৪০২৭ নম্বর হাদীস পাঠ করলে এ বিষয়ে কিছু নিদর্শন, নযীর এবং নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

সুতরাং বাংলাভাষাভাষী মুসলমান হিসেবে আমাদের করণীয় অনুধাবন করতে হবে। আমরা একটি সমৃদ্ধ ভাষার অধিকারী—এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ভাষার অধিকার আমাদেরই গৌরব ও কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শন। কিন্তু কোনো ভাষার সব শব্দ ওই ভাষাভাষীর সব পর্যায়ে, সব পরিস্থিতি ও পরিচিতির জন্য প্রয়োগসিদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক হয় না। এ কারণেই আরবী ভাষায় অনেক শব্দ বদল করে ব্যবহার করতে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করেছিলেন। এতে বোঝা যায় উপযোগিতা বিবেচনা করে সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক শব্দের প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত ভাষারীতির ব্যবহারই কাম্য। এ প্রয়োগই ভাষার গৌরবের জন্য সবচেয়ে সহায়ক ও কল্যাণকর। আমাদেরও উচিত, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচিতি ধরে রাখার জন্য আল্লাহর দেওয়া ভাষার যথোপযুক্ত প্রয়োগ ও ব্যবহার। শব্দে-ভাষায় এ স্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বলতার অনুসন্ধানই হোক আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অঙ্গীকার। ■

[*মাসিক আলকাউসার* : ফেব্রুয়ারি ২০১৫]

পয়লা বৈশাখ : এখন যেমন

মিরপুর বার নম্বর বাসস্ট্যান্ড থেকে কালশি সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় যাচ্ছি। রিকশায় বসে। ছোট্ট একটা প্রয়োজনে একটা দোকানের সামনে থামলাম। আমার সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছেন। পেছন থেকে এক নজর দেখে একজনকে মনে হলো, শীর্ণকায় হিন্দু বৃদ্ধ। পাঞ্জাবি, ধূতি পরা। কাছে যেতেই দেখি, সে আসলে এক যুবক। শহুরে হিন্দু যুবকরা এখন আর ধূতি পরে না বলেই এ দৃশ্য দেখে কিছুটা অবাক হলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করলাম, তার গায়ের ধূতিটা আসলে ধূতি নয়, 'ধূতি-পায়জামা'। ধূতির মতোই কুচি, ধূতির মতোই স্ফীত। শুধু ধরে রাখার জন্য মাঝে একটা সেলাই। কথায় ও আচরণে বুঝতে পারলাম, ছেলেটা মুসলিম। ঘটনাটি দু' বছর আগের এক পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যার।

দুই.

আর কদিন পরই পয়লা বৈশাখ। সৌরবর্ষ কিংবা বাংলা বর্ষের হিসেবে নববর্ষ। শুরুতে গ্রাম বাংলা ও মফস্বলের হালখাতার এ দিনটি এখন রাজধানীসহ নগরজীবনে বিরাট আয়োজন করে পালিত হয়। চিত্রটি জাঁকালো হয়ে উঠেছে গত দুই-তিন দশকে। পান্তা-ইলিশ, মেলা, চড়ক, বিশেষ রঙের শাড়ি আর বিশেষ ধরনের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষের থৈ থৈ স্রোত নামে রাস্তায়। এক দিনের জন্য বাঙ্গালি সাজার একটা ধুম পড়ে যায়। দেখা যায়, বাঙ্গালি সাজার প্রতিযোগিতায় ছুটতে গিয়ে পোশাক-আশাক থেকে নিয়ে জীবন ও আচারের বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিবেশী ধর্মের সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করতেও পিছপা হয় না নতুন প্রজন্মের মুসলিম নর-নারী। এ যেন এ প্রজন্মের দেশ ও জাতিপ্রেমের নতুন মহড়া। বাংলা সালের শেষ মাস চৈত্রের শেষ দিনে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে

নিয়ে নববর্ষ উদযাপনের ধাপে ধাপে ভিন্ন ধর্মের প্রতীক ও বিশ্বাস জড়িত আচরণে নিজেদের তারা সঁপে দিচ্ছে। বুঝে না বুঝে।

তিন.

পয়লা বৈশাখে আগে গ্রামগঞ্জে ও মফস্বলে 'হালখাতা' অনুষ্ঠান হতো। মুসলিম ব্যবসায়ীরা নতুন হিসাব-নিকাশ শুরু করে দোকানে দুআ করাতেন। হিন্দুরা পূজা-অর্চনা করে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালাত। বছরের প্রথম দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ শুরুর একটা আনুষ্ঠানিকতা ঘোষিত হতো, যার যার রীতিতে। কোনো কোনো গ্রামে হাতে বানানো জিনিসপত্র ও তৈজসপাতি বেচাকেনার হাট বসত। কেউ বেচতে যেত, কেউ কিনতে। নগরজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, সব গ্রামেও এ দিনটি নিয়ে তেমন কোনো মাতামাতি হতে দেখা যেত না। প্রধানত ব্যবসা ও দোকানদারির হিসাব শুরু-শেষের সঙ্গেই এর আনুষ্ঠানিকতা আবদ্ধ থাকত। কিন্তু গত দুই দশকে হঠাৎ করে বিস্তৃত গণমাধ্যম ও মুসলিম জাতিসত্তার সঙ্গে বৈরিতাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এ দিনটিকে 'বাঙ্গালি সংস্কৃতির ঠিকানা' বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে। নগরজীবনে হাঁসফাঁস করা মানুষের একটি অংশ উৎসবের গন্ধ পেয়ে এ দিনটিতে পথে নামতে শুরু করেছে।

পরাণুকরণবাদী সুশীল, সংস্কৃতিকর্মী ও শেকড়ভুলা বাজারবাদী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের সুবাদে এ মিথ্যাটাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, বাংলা বছরের পয়লা দিনটিকে উৎসব করে কাটাতে হবে হিন্দুয়ানী তথাকথিত বাঙ্গালি সংস্কৃতির অনুষঙ্গগুলো আপন করে নিয়ে। এটাই বাঙ্গালি জাতির আবহমান কালের সংস্কৃতি। মুসলিম জাতিত্ব ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য, বিধিবিধান ও রুচিবোধের কোনো প্রশ্ন এখানে উঠানো যাবে না। এখন 'বাঙ্গালি' নাম দিলেই হলো, কোনো আচরণ ও অনুষ্ঠানে নিজেদের সঁপে দিতে ঢাকা মহানগরীর একটি অংশের মানুষের আর কোনো আপত্তি নেই।

চার.

আরেকটি বিষয় এখানে বড়। সেটি হচ্ছে, অনুষ্ঠান ও উৎসব-প্রবণতা এবং এর সঙ্গে হুজুগ। এই উপাদানটা যেখানে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে

এ দেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকে বাতাস দেওয়া। এতে ষোলকলা পুরা হয়। গত দুই দশক ধরে এ অবস্থাটাই দেখা যাচ্ছে। শুধু পয়লা বৈশাখের মাতামাতির মধ্যে চোখ আটকে রাখলে বিষয়টা বুঝতে সমস্যা হবে। একটু অন্যদিকেও চোখ ফেরানো যাক।

এ দেশে কি ৩১ ডিসেম্বর রাত বারটার পর কোনো অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল বিশ বছর আগে? ছিল না। মিডিয়াও সেটা নিয়ে কোনো ভূমিকা তখন রাখেনি। হঠাৎ মহানগরীর কোনো কোনো অভিজাত এলাকায় থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনের খবর প্রচার হলো। মিডিয়া দিল আরো বাতাস। শুরু হলো প্রস্তুতি। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে নিয়ে সারা দেশে এ রাতটা সরগরম হয়ে উঠল। মনে হতে থাকল এটাই এ জাতির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি। ইদানীং অবশ্য উন্মাদনা বেড়ে যাওয়ায় কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি 'তথাকথিত' ভালোবাসা দিবসের কথা কি এ দেশে কেউ জানত? জানত না এবং কেউ ঘুণাক্ষরেও এ দিনটি নিয়ে কিছু ভাবত না। মিডিয়া বাতাস দিল। তরুণ-তরুণীদের গায়ে আগুন লেগে গেল। দেশব্যাপী এটা এমনভাবে পালিত হতে লাগল, মনে হতেই পারে– এটা এ দেশের আবহমান কালের একটা সংস্কৃতি। এখন খুবই লজ্জা লাগে, এ দিনটা উপলক্ষে যখন অপরাপর বহু জিনিসের সঙ্গে বিশেষ ধরনের কনডমের বিজ্ঞাপনও পত্রিকার পাতায় চোখে পড়ে।

ফুটবল বিশ্বকাপ আর ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথাই ধরুন। এমন হুজুগ আর মাতোয়ারা অবস্থা এদেশে ইদানীং তৈরি হয়েছে, মনে হতে থাকে দেশবাসীর সামনে আর কোনো সমস্যাই নেই। ভাবা ও করার মতো কোনো কাজই বাকি নেই। এটাই সবার আচার-অনুষ্ঠান। এটাই সবার ধ্যান-জ্ঞান। তাহলে এসবও কি এ দেশের সংস্কৃতির অঙ্গ?

পাঁচ.

হুজুগ পেয়ে গেলেই যে কোনো আচার-অনুষ্ঠান ও ইস্যুকে জোর করে সার্বজনীনতা দেওয়া বাংলাদেশের প্রভাবশালী মিডিয়ার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এ কারণে তারা এসব হুজুগে ইস্যুকে দেশপ্রেম ও জাতির প্রতি

বিশ্বস্ততার মাপকাঠি বানিয়ে ছাড়ে। পয়লা বৈশাখের কথাই বলুন, ক্রিকেট বিশ্বকাপের কথাই বলুন, এখানে কেউ স্রোতের উল্টা কিংবা নিস্পৃহ থাকলে তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। ভাবখানা এমন যে, এই স্রোতে ভাসলেই তিনি দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, উল্টোটা হলে তার মাঝে দেশপ্রেম নেই, সে দেশের শত্রু।

সৈয়দ আবুল মকসুদ একজন সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। ২০১৩ সালে দৈনিক সমকাল-এর ১ বৈশাখের ক্রোড়পত্রে ছাপা হওয়া তার লেখার একটা অংশ উদ্ধৃত করছি–

'আমি আমার নিজের শৈশব ও কৈশোরের পহেলা বৈশাখকে যেভাবে দেখেছি, আজকের পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সঙ্গে সেই নববর্ষ উৎসবের কোনো মিলই নেই। তখনকার নববর্ষের উৎসবের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম প্রাণের আমেজ, তাতে ন্যূনতম কৃত্রিমতা ছিল না, আয়োজনে বিন্দুমাত্র মেকি বা লোক দেখানো বিষয় ছিল না। যা করা হতো, তা হতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে, প্রাণের আনন্দে ও অকৃত্রিম জাতীয়তাবাদী আবেগে।

আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পহেলা বৈশাখের সকালে ঘটা করে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব বিত্তবান ঘরের মানুষ মাটির শানকিতে পান্তাভাত, খাট্টা ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, মুড়িঘণ্ট, খেজুর গুড়ের ক্ষীর হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে। এই যে রেওয়াজ শুরু হয়েছে, এটি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রবর্তিত আয়োজন। এ জাতীয় জিনিস পহেলা বৈশাখে নববর্ষের চিরকালের চেতনা বিরোধী। কারণ এ সমাজের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ খুবই দরিদ্র, তারা ক্ষুধার জ্বালায় পান্তাভাত, পচা ডাল ও অখাদ্য জাতীয় জিনিস যা পায় প্রতিদিন তা-ই খায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে পান্তাভাত আর ইলিশের তরকারি, মুড়িঘণ্ট যারা খায়, তারা বস্তুত এক ধরনের সাংস্কৃতিক অপরাধ করে। এসব আচরণের মাধ্যমে তারা আসলে দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষকে পরিহাস করে।'

পয়লা বৈশাখের বর্তমান রেওয়াজ ও মাতামাতি সম্পর্কে এ কথাগুলো কোনো মাওলানা সাহেবের বলা নয়। কথাগুলো যিনি লিখেছেন, তিনি কথিত বাঙ্গালি সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করেন। তারপরও সত্য স্বীকার করে তিনি কথাগুলো লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

ছয়.

পয়লা বৈশাখের কথা এলেই অবধারিতভাবে আসে সংস্কৃতির কথা। স্থানীয় সংস্কৃতির সূত্র ধরে জোরটা দেওয়া হয় 'বাঙ্গালি সংস্কৃতির' ওপর। আর বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে সামনে আনা হয় হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতীক ও আচার-অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে উপরের সূত্র ও নীতি অনুসরণ করে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করা-না করার প্রস্তুতিকে চিহ্নিত করা হয় জাতীয়তার মিত্রতা ও শত্রুতা হিসেবে। এভাবে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার জন্য একটা প্রবল ও গভীর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এ দেশের সব স্তরের মুসলিম নাগরিকদের ওপর।

প্রশ্ন হচ্ছে, এক্ষেত্রে আসলে মুসলমানদের করণীয় কী? স্থানীয় সংস্কৃতির নামে অপর ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকসহ যে কোনো উৎসব ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ কি ইসলামে আছে? ইসলাম যে অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে, সেখানকার ভালোমন্দ সব সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার অনুমতি কি তার অনুসারীদের দেয়?

হাদীস শরীফের ভাষ্য, সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং ইসলাম বিস্তারের দীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাস থেকে যে সত্যটি ফুটে ওঠে সেটি হচ্ছে, বিশ্বাস, ইবাদত ও জীবনাচারের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম যে পয়গাম নিয়ে এসেছে সে ব্যাপারে ইসলাম আপসহীন। জীবনাচারের মৌলিক বিষয়ে ইসলাম তার সুনীতি ও শুদ্ধির দীক্ষা দিয়ে কখনো কখনো সেসবের অনুষঙ্গগুলো স্থানীয় সংস্কৃতির ওপর ছেড়ে দেয়। মৌলিক বিষয়ে মিশে যাওয়া ও একাত্ম হওয়ার নীতি ইসলামে থাকতে পারে না। কারণ দূষণ দূর করে শুদ্ধতা আনাই ইসলামের কাজ। এ কারণেই অপর ধর্মের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ও অপর ধর্মের পরিচায়ক কোনো বৈশিষ্ট্যকেও আপন করে নেওয়ার অনুমতি ইসলাম মুসলমানদের দেয় না।

পশু জবাই করার ইসলামী নীতি অনুসৃত হওয়ার পর সে পশুর গোশত ভুনা করে, না কি ঝোল করে, না কি কাবাব করে খেতে হবে, এ বিষয়ে ইসলামের কোনো চাপ নেই। স্থানীয় মানুষের রুচি ও সুবিধার ওপর তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাছের তরকারির ধরন কী হবে, তাজা হবে না কি শুটকি হবে, হালাল জিনিস দিয়ে বানানো রুটি বা পিঠার ধরন কী হবে,